BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120002

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার স্বরূপ সন্ধান ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত

Amartya Panja[1] & Dr. Chandra Sekhar Halder[2]

1. Ph.D. Research Scholar, Department of Bengali, YBN University, Ranchi, Jharkhand
Email: amartyapanja2909@gmail.com

2. Assistant Professor, School of Arts and Humanities (dept. of Bengali), YBN University, Ranchi, Jharkhand

Abstract:

লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা মানবসমাজের প্রাচীনতম চিকিৎসা-জ্ঞানব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশের পূর্বে গ্রামীণ সমাজে রোগ নিরাময়ের প্রধান উপায় ছিল প্রকৃতিনির্ভর ভেষজ উদ্ভিদ, আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র এবং অভিজ্ঞতালব্ধ চিকিৎসা-পদ্ধতি। বাংলার মধ্যযুগীয় সাহিত্য এই লোকজ জ্ঞানভাণ্ডারের মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কাব্যে লোকজ চিকিৎসা ও ভেষজ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সেই সময়ের সামাজিক জীবন, বিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যচর্চার প্রতিফলন বহন করে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে নিমপাতা, তুলসী, হলুদ, আদা ইত্যাদি ভেষজ উপাদানের ব্যবহার এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত আলোচিত হয়েছে। গবেষণাটি দেখায় যে লোকজ চিকিৎসা কেবল রোগ নিরাময়ের উপায় নয়, বরং এটি সমাজের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনদর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ফলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য লোকজ চিকিৎসা-সংস্কৃতির ইতিহাস অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

Keywords: *লোক-ঔষধ, লোক-চিকিৎসা, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য, ভেষজ চিকিৎসা, মঙ্গলকাব্য, লোকজ জ্ঞান, গ্রামীণ স্বাস্থ্যচর্চা।*

মূল আলোচনা:

অনুন্নত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বহমান জীবন ধারায় প্রয়োগধর্মী লোক-সংস্কৃতির আঙিনায় লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা আজও মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।বস্তুত, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বলেই রোগ-যন্ত্রণা নিরসনের উপায় খুঁজতে গিয়ে মানুষকে দারস্থ হতে হয়েছে চিকিৎসার, সন্ধান করতে হয়েছে রোগ মুক্তির নানা উপাদান। আর সেই তাগিদই মানুষকে প্রবৃত্ত করেছে লোক-ঔষধের সুলুক সন্ধানে ।বলাবাহুল্য, প্রাচীন ভারতবর্ষই চিকিৎসা

শাস্ত্রের আঁতুড় ঘর ।সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে কিভাবে বাংলার মানসলোক ও জনজীবনে সম্পৃক্ত হয়ে উঠলো, কিভাবে মানুষের বিশ্বাস চেতনা ও ভরসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠলো -- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করে আলোচ্য নিবন্ধে সেই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে চাই।

তবে, মূল নিবন্ধের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন ।অনেক ক্ষেত্রে, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসাকে আমরা সমার্থক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকি ।বলাবাহুল্য, দুটো বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণ এক নয় ; একটু হলেও আলাদা। একটা সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে -- বাজার থেকে রান্নার সামগ্রী কিনে আনা এবং রান্নার উদ্দেশ্যে কাটাকাটি বাটাবাটি করে প্রস্তুত করা ও রান্না করা যেমন এক বিষয় নয়, তেমনি লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার ব্যাপারটির মধ্যেও কিছু পার্থক্যগত দিক রয়েছে ।লোক-ঔষধ বলতে সাধারণত ঔষধ তৈরির মূলগত উপাদানকে বোঝানো হয়, যা প্রধানত ভেষজ উপাদান ।এই ভেষজ উপাদান গুলিকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে যখন তা প্রয়োগ করা হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে লোক-চিকিৎসা ।অর্থাৎ, এক কথায় বলা যেতে পারে লোক-ঔষধ হলো উপাদানগত দিক এবং লোক-চিকিৎসা হলো এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ প্রয়োগগত দিক ।কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, লোক-চিকিৎসা ভেষজ উপাদানকে অঙ্গীকরণ না করে বেশ কিছু অতিলৌকিক বা অলৌকিক বিষয়ের ওপর নির্ভরতার কথা বলে, যা একান্তভাবেই লোক-বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল, যার কোনো বাস্তব বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই ।তবে একথা স্বীকার্য যে, লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা বিষয়টি বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পৃক্ত ।

এবার আসা যাক মূল বিষয়ের আলোচনায় ।অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই বেদ, পুরাণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সহ সাহিত্যের বিবিধ শাখা-প্রশাখায় লোক-ঔষধ তথা লোক-চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ অবদান খুব সহজ এবং সহজাতভাবেই স্বীকৃত হয়েছে ।আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-১০০০ অব্দে রচিত অথর্ববেদ প্রসঙ্গে কেনেথ জিস্ক মনে করেন, ধর্মীয় ঔষধ ও চিকিৎসা বিদ্যার বিবর্তনের প্রাচীনতম নথিগুলির মধ্যে অথর্ববেদ অন্যতম, যা ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের লোক চিকিৎসার আদি রূপটিকে প্রকাশ করেছে। ঋগ্বেদেও অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে দুই চিকিৎসক প্রসঙ্গে জানা যায় ।এর পরবর্তী সময়ে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যাঁরা সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তাঁরা হলেন চরক ও সুশ্রুত ।পাণিনির রচনা থেকে আমরা চরকের কথা জানতে পারি ।আর সুশ্রুতের সময়কাল চরকের পরে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ তিনি ।পরবর্তীকালে সুশ্রুতের সংস্করণ নাগার্জুনের হাতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে ।চরকের লেখায় শিশু ও মেয়েদের গর্ভধারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে, তবে শল্য চিকিৎসার উল্লেখ নেই ।অন্যদিকে সুশ্রুত-এর লেখায় অর্শ, ভগন্দর ও পাথুরী রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে শল্য চিকিৎসার প্রায়োগিক দিকের উল্লেখ রয়েছে ।এমনই আরও বহুবিধ রোগের চিকিৎসা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে ‘চরক সংহিতা’ ও ‘সুশ্রুত সংহিতা’ নামক সে যুগের দুটি বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক সংকলন গ্রন্থে। আমাদের প্রাচীন কাব্য ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারতে’ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল কিংবা কৌরব কর্তৃক ভীমের ওপর বিষ প্রয়োগ করা হলে অথবা সর্প-বৃশ্চিক প্রভৃতি প্রাণীর দংশনজাত বিষক্রিয়া থেকে মুক্তির জন্য লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকার কথা প্রমাণিত হয়েছে বারবার ।এমনকি জরাসন্ধর জন্ম বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্র থেকে শল্য চিকিৎসারও প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায় ।এমনকি তখনকার জনগণ যে রাক্ষসী বিদ্যা সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল, সে জাতীয় চিকিৎসার পরিচয়ও সে যুগে মেলে।

পরবর্তী ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ যুগের প্রথম ভাগে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল ।সেসময় মৃতদেহ স্পর্শ করা বা মৃতদেহের কঙ্কাল কেন্দ্রিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টিও প্রচলিত ছিল ।কিন্তু বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই ধরণের বিষয়গুলিকে নীচ কাজ বলে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল ।ফলত, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষত শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় সে সময় ।চিকিৎসা জগতে নেমে আসে ব্যাপক বিপর্যয়।

তবে, বুদ্ধের মৃত্যুর ৬০০ - ৭০০ বছর পর এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বৌদ্ধরা আবার গভীরভাবে ভাবিত হলো এবং শুরু হলো চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি বিধানের কাজ ।পুরোনো বিপর্যয় মোকাবিলা করে যখন নতুন করে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির সোপান রচিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই ভারত বৈদেশিক আক্রমণের কবলিত হয় ।ফলে অবহেলিত হতে থাকলো প্রাচীন ভারতের বৈদ্যক শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, বিষ-চিকিৎসা, শল্য বিদ্যা -- সমস্ত কিছুই ।পরিবর্তে প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো ইউনানী বা হেকেমি পদ্ধতি ।এরপর অন্ধকার যুগ থেকে একটু একটু করে স্থিতি লাভ করলে মধ্যযুগীয় বাংলায় লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসা কিভাবে সমাজে ও জনমানসে প্রভাব বিস্তার করলো, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করে তার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করবো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার নানাবিধ বর্ণনা ।কোথাও ভেষজ উদ্ভিদের প্রয়োগ-জাত চিকিৎসা, কোথাও মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, কবচ-তাবিজ, তেলপড়া, জলপড়া কিংবা যজ্ঞ, শান্তি-সস্তায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতির বিবিধ দিককে তুলে ধরা হয়েছে ।আলোচনার সুবিধার্থে এই পর্বের বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত রোগ-ব্যাধি-যন্ত্রণার চিকিৎসাকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যথা --

(ক) দৈহিক রোগ-যন্ত্রণা কেন্দ্রিক চিকিৎসা

(খ) মানসিক সমস্যা বা বিকার জনিত ব্যাধির চিকিৎসা

(গ) লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার জাত চিকিৎসা

(ঘ) মঙ্গল সাধন কিংবা অনিষ্ট সাধন অথবা বিশেষ কোনো অভিসন্ধি চরিতার্থে ব্যবহৃত লোক-চিকিৎসা ।

(ক) দৈহিক রোগ-যন্ত্রণা কেন্দ্রিক চিকিৎসা

দৈহিক অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ-গাছালির পাশাপাশি তেলপড়া, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্র তন্ত্র এমনকি ব্রাহ্মণের পা ধোওয়া জল খাওয়ারও প্রসঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আনাচে কানাচে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় লঙ্কা যুদ্ধে যখন গুরুতর আহত হয়েছে রাম-লক্ষণ সহ বিশাল বানর সৈন্যকুল, তখন তাদের জীবন রক্ষার্থে সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পাওয়া গেছে ঋষ্যমূক পর্বতে ।আর সেখানে --

"চারি বৃক্ষ আছয়ে ঔষধ চারিজাতি।

অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি।।

বিশল্যকরণী এক সর্বলোকে জানি।

দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃত সঞ্জীবনী।।

তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থি সঞ্চারিণী।

চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী "।।[১]

এইসব নিদান লোক-ঔষধ এর গুণাগুণকেই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলে ।অন্য একটি প্রাচীন ছড়াতে ক্ষত বা ঘায়ের মহৌষধের উল্লেখ মেলে --

"কাল্যা লতার পাতা শুষ্ক ক্ষতে প্রলেপ।

ইহাতে নিশ্চয় জান হয় ক্ষত ক্ষেপ "।।[২]

অল্প-বিস্তর শল্য চিকিৎসার সন্ধান মিলেছে মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে ।মুকুন্দরামের 'চণ্ডীঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় প্লীহা কাটানো অর্থাৎ চোখের ছানি কাটার ক্ষেত্রে মারাঠীরা যথেষ্ট দক্ষ ছিল --

"ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্গে পিলুই কাটে

ছানি ফাঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা "।।[৩]

ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালাতে মৃতপ্রায় নদের চাঁদকে সুস্থ করে তুলবেন বলে মহুয়াকে আশ্বস্ত করেছেন সন্ন্যাসী এবং গাছ-গাছালির সাহায্য নিয়েছেন নদের চাঁদকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য --

"বনে আছে গাছের পাতা তুইল্লা দিবাম আমি।

এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী "।।[৪]

'রক্ত পিত্তে' রোগীকে নিরাময়ের জন্য 'কুষ্মাণ্ড খন্ড' দেওয়া হতো ।কফ নিবারনের ওষুধ হিসাবে দেওয়া হতো 'পিপ্পলিখণ্ড', পেটের বেদনায় 'সোমরাজ' ইত্যাদির পাশাপাশি চলতো 'বৈদ্যকের দু-এক প্রকার মুষ্টিযোগ' ।সমকালীন সাহিত্যে যে সালি-বিসালি বৃক্ষ ও তার পাতার বর্ণনা পাওয়া যায় তা বৃশ্চিক-সর্পাদির দংশনের অব্যর্থ ঔষধ রূপে কাজ করতো এবং সেইসঙ্গে অবশ্যম্ভাবী রূপে ব্যবহৃত হতো সমুদ্রের ফেনা।

সর্প-দংশনের প্রতিকারকল্পে ওষধি বৃক্ষের পাশাপাশি ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রের সাথে সাথে চড়-চাপড় মেরে বিষ নামানোর চিকিৎসা পদ্ধতিও আমরা দেখতে পাই ।এই বিদ্যাকে 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বলা হয়েছে 'নাগবাচা' বিদ্যা --

"নাগবাচা বিদ্যা দেবি পড়িল আপনি।

ঝাটো আসিলেন বিষ কালী নাগিনী।।

মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে।

ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে "।।[৫]

সেযুগের ওঝারা দীর্ঘদিনের মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম ছিলেন এমন তথ্যও পাওয়া যায় --

"ভীমসরের পানি দিব সভাকার গায়।

বার বৎসরের মড়া উঠিয়া ডাড়ায় "।।[৬]

এমনকি, মন্ত্রপুত জলের দ্বারা মানুষ সহ জীবজন্তুদেরও বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লেগে জীবিত হয়ে ওঠার বিস্ময়কর কাহিনিও পাওয়া যায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' --

"উশনা কুশপানি চিন্তিয়া সঞ্জীবনী

মন্ত্রিত কৈল কুশজল।

দিলেন যার অঙ্গে করিয়া অঙ্গ ভঙ্গে

উঠিল সেই মহাবল।।

* * * * * *

আনহি কন্ধ শির পড়িল যেই বীর

জুড়িল তাহার কন্ধ মুণ্ডে।

পাইয়া কুশজল উঠে দন্তিদল

লোহার মুদগর শুণ্ডে।।

কাটা অশ্ব যত জুড়িল শত শত

আনহি কন্ধে আনে শির।।" [৭]

এই মন্ত্রপূত জল ব্যবহার করা হয়েছে সুপ্রসবের ক্ষেত্রেও ।দ্বিজরাম দেবের ধর্মমঙ্গলে এর প্রমাণ মেলে --

"দারুণ ব্যথায় রঞ্জা কান্দিয়া বিকল।

মুখে তুল্যা দিল দাই ঔষধের জল "।।[৮]

যদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' কাব্যেও একইভাবে সুখ-প্রসবের জন্য মন্ত্রিত জল বা 'জাওন' ব্যবহারের বিষয়টি চোখে পড়ে --

"মেনকাবতী ধাই আসি পাতাইলো জাওন "।[৯]

(খ) মানসিক সমস্যা বা বিকার জনিত ব্যাধির চিকিৎসা

মানসিক সমস্যা বা বিকার জনিত ব্যাধিরও নানাবিধ ঔষধ ও চিকিৎসা প্রসঙ্গ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু জায়গা দখল করে রেখেছে ।বায়ু-বিকার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে স্বাভাবিক এবং সহজাত ভাবেই ।বায়ুবিকার জনিত রোগ দেখা দিলে মাথায় বিষ্ণু তৈল বা বহুবিধ সুগন্ধিযুক্ত পাক তৈল মালিশ করা হতো -- 'বহুবিধ পাক তৈল সভে দেই শিরে'।[১০] আবার রোগের আধিক্যের কারণে রোগীকে অনেক সময় তৈল পূর্ণ বৃহৎ পাত্রে অর্থাৎ 'তৈলদ্রোণে' নিমজ্জিত রাখা হতো -- 'তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে' ।[১১] এছাড়াও ডাব নারকেলের জল খেতে দেওয়া হতো --

"খাইবারে দেহ ডাবু নারিকেল জল।

যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল "।।[১২]

এসব চিকিৎসাও যদি ব্যর্থ হতো, তাহলে এ ধরণের মনোবিকার জনিত উত্তেজিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পা দুখানি বেঁধে 'শিবাঘৃত' প্রয়োগের কথাও জানা যায় তৎকালীন চিকিৎসায় --

"দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে।

শিবা-ঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে "।।[১৩]

কেউ সাময়িকভাবে মূর্চ্ছা গেলে 'চামর বাতাস' করার পাশাপাশি মুখে জল ও মরীচের গুঁড়ো দেওয়ার কথা জানা যায় --

"বুড়া রাজা মুর্চ্ছা হলো উঠে হায় হায়।

মুখে জল দেয় কেহ মরীচের গুড়া "।।[১৪]

(গ) লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার জাত চিকিৎসা

মধ্যযুগে বাঙালি জনমানসে লোক-বিশ্বাস জাত অন্ধ আচার-বিচার, বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ আবর্ত মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুতা এবং কর্মফলবাদের ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল ।তাই, দেহের বিভিন্ন রোগ-বিকারের ক্ষেত্রে প্রাক্তন কর্মকাণ্ডকেই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী

করা হতো ।সেক্ষেত্রে, ঔষধ সেবনের পূর্বে চলতো পাপ মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান, পাশাপাশি ব্রাহ্মণের পা-ধোওয়া জলপানও ।সে যুগের সাহিত্যে বিপ্র-পাদোদক সেবনের বিষয়টি একপ্রকার মহৌষধ হিসাবেই সমাদৃত হয়েছে --

"সর্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে "।।[১৫]

আবার, কুষ্ঠ রোগের ক্ষেত্রে মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ জনিত ফলশ্রুতিতেই শরীর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় ।'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'গোপাল-চাপালের' কুষ্ঠ রোগের কারণ হিসাবে তাদের বৈষ্ণব বিদ্বেষের মানসিকতাকেই দায়ী করা হয়েছে ।সেক্ষেত্রে, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের আশীর্বাদেই রোগ নিরাময় সম্ভব বলে মনে করতেন তখনকার জনসাধারণ । সে যুগের লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী মানত পুজো, শান্তি সস্তায়ন, দেবস্থানে হত্যে দেওয়া, মন্ত্র-তন্ত্র, দেবানুগ্রহে রোগ মুক্তি ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় ।এমনকি, মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা দেবতাকে বশীভূত করে রোগ মুক্তির সন্ধান করেছে তখনকার সমাজ -- 'মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা '।[১৬]

লোক-বিশ্বাস ও চিরাচরিত সংস্কারের বশবর্তী হয়েই রামায়ণ মহাভারতের কাল থেকে অপুত্রক নারীরা সন্তানবতী হওয়ার জন্য দেব স্থানের ঔষধ গ্রহণ কিংবা পূজার্চনা বা যজ্ঞের মাধ্যমে দৈবী কৃপালাভে সচেষ্ট হয়েছেন। এ ধরণেরও প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ।রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের বন্দনা অংশে আমরা দেখি --

"কামারহাটির পঞ্চানন্দ বন্দো জোড় হাতে।

ছেলের তরে কত মেয়ে ঔষধ যায় খেতে "।।[১৭]

বন্ধ্যা নারীদের পাশাপাশি এ ধরণের বিশ্বাসের বশবর্তী ছিলেন মৃতবৎসা রমণীরাও।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরও চোখে পড়ে ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি অপদেবতা জনিত বিশ্বাস ; যা থেকে মানুষের মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে বাতাস লাগা, নজর লাগা, ভুলো লাগা কিংবা বান মারার ধারণা ।ওঝা-গুণীনদের ভূত তাড়ানোর একটি সরস বর্ণনা পাওয়া যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে --

"আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।

মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে।।

তিন চাপড় মারি বলে ভূত পালাইলো "।[১৮]

কুদৃষ্টি জনিত বাতাস লাগার প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের শৈশব কালের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে -- "ডাকিনী দানবে পাছে বল করে" [১৯] , সে কারণে সকলে সদা সতর্ক থাকতেন ।জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় শিশু চৈতন্য অনবরত কাঁদতে থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন শচীদেবী --

"ছাদন অঙ্গখানি দেখিল কে।

না জানি পাইল কোন দানব দে।।

মুখে না দেহ স্তন তপন গা।

কথা না পাইল পুতের উপর বা "।।[২০]

(ঘ) মঙ্গল সাধন কিংবা অনিষ্ট সাধন অথবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি চরিতার্থে ব্যবহৃত লোক-চিকিৎসা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে লোক-ঔষধের ব্যবহার কিংবা লোক-চিকিৎসার প্রয়োগগত বেশ কিছু অভিনব দিকের কথাও বর্ণিত হয়েছে।যেমন রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে' লোক ঔষধ ব্যবহৃত হয়েছে রাজা লাউসেনের হাতে কলিঙ্গ রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য --

"গুয়া পান সারিয়া ঔষধ কত তোলে।

যেন রাজা লাউসেন কলিঙ্গা রাখে কোলে "।।[২১]

তবে, শুধুমাত্র মঙ্গল কামনায় বা হিত সাধনায় নয়, স্বামী বা নিজের প্রিয়জনকে বশ করা, সম্মোহিত করা কিংবা সতীন কাঁটা বা শত্রুকে নির্মূল করার জন্য মধ্যযুগে লতা-পাতা, শিকড়-বাকড়, তুকতাক ইত্যাদির ব্যবহারের বহুল পরিচয় পাওয়া যায় । মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বণিক খণ্ডে দেখা যায়, স্বামী ধনপতিকে বশ করার জন্য লহনা দাসী দুর্বলাকে পাঠিয়েছে তার সই ব্রাহ্মণী লীলাবতীর কাছে, বশীভূত করার ঔষধ সংগ্রহের জন্য ।মঙ্গলকাব্যের পরতে পরতে এজাতীয় বিষয়গুলির বহুল পরিচয় মেলে ।ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও আমরা দেখি --

"অনেক ঔষধ : করিয়া পরিচ্ছদ : বেহুলা দিল পতি ভালে।

সুন্দর লখিন্দরে : বরণ করি তারে : অমলা বাণ্যানী চলে "।।[২২]

এমনকি, জামাতা বরণের সময় কিংবা নব জামাতাকে খাওয়ানোর সময় কনের মাতারাও বশীকরণের ঔষধ ব্যবহার করেছে --

"মিষ্টি পরমান্ন দধি মধু আন

যত দ্রব্য দিল পাছে।

ঔষধের তর করিল অন্তর

রাখিল থালের কাছে "।।[২৩]

আবার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে দেখা যায়, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় চরিতার্থ করার জন্য মন্ত্রের ব্যবহার ।'বংশী খণ্ডে' বড়াই রাধাকে প্ররোচিত করে কৃষ্ণের মোহন বাঁশি চুরি করার জন্য ।এবং রাধাকে সহায়তা করার জন্য 'নিন্দাউলী' মন্ত্রের ব্যবহার

করেছে বড়াই -- 'নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আমি '।বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে'ও এরকম নিদ্রাকারক মন্ত্রের সন্ধান মেলে, যার নাম 'নিদ্রালী'।

পরিশেষে বলবো, মধ্যযুগের বিস্তীর্ণ পরিসরে বিভিন্ন শতক জুড়ে বাংলা সাহিত্যে লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার যে বহুবিধ বিচিত্র দিকসমূহ এবং প্রয়োগগত বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা শুধুমাত্র সেই যুগকেই নয় ; আধুনিক যুগের সাহিত্যে সর্বোপরি সমাজ জীবনেও বহুমাত্রিক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে সমান তালে।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীরাম পাঁচালী, লঙ্কা কাণ্ড, 'শ্রীরাম লক্ষণাদির রক্ষা নিমিত্ত বিভীষণ হনুমান ও জাম্ববানের মন্ত্রণা'।

২. চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র, ২য়, পৃ. ৬৭।

৩. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, প্রথমভাগ, পৃ. ৩৬১।

৪. ময়মনসিংহ গীতিকা, মহুয়া পালা, দ্বিজ কানাই প্রণীত, 'পর্বতে বনপথ; অদূরে ভগ্ন দেবমন্দির, সন্ন্যাসীর পালা'।

৫. বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা বিজয়, পৃ. ২২১।

৬. বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, পৃ. ২২।

৭. সুকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল, চতুর্থ দিবস : দিবা ১৭১, পৃ. ১০১।

৮. বিশ্বভারতী পুঁথি, সংখ্যা ৬৫৬১। প. সং. ৩৩ খ।

৯. যদুনাথের ধর্মপুরাণ, পৃ. ৬৯।

১০. চৈতন্য ভাগবত, পৃ. ৮৫।

১১. ঐ, পৃ. ৮৫।

১২. ঐ, পৃ. ১৬১।

১৩. ঐ, পৃ. ১৬১।

১৪. ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৭৮।

১৫. চৈতন্য ভাগবত, পৃ. ১৩১।

১৬. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৩১।

১৭. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৬।

১৮. চৈতন্যচরিতামৃত, (অ), পৃ. ৩২৫।

১৯. চৈতন্য ভাগবত, (অ), পৃ. ৫৭।

২০. বিশ্বভারতী পুঁথি, সংখ্যা ১৯০৯।

২১. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, কলিঙ্গ বিভা পালা।

২২. ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, পৃ. ২৫১।

২৩. জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, পৃ. ২০২।

সহায়ক গ্রন্থ :

- রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, প্রথম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২৬ শে জানুয়ারী, ১৯৮০।
- রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯।
- ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৪।
- ভট্টাচার্য, ড.আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৭২।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া,পুনর্মুদ্রণ ২০১৭।
- দাস, ড. ক্ষুদিরাম (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন চণ্ডী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭।
- সেন, ড. সুকুমার, মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯।

- সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬২।
- সেন, ড. সুকুমার (সম্পাদিত), মনসা বিজয়, বিপ্রদাস পিপিলাই, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৫৫।
- সেন ড. সুকুমার (সম্পাদিত), বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮।
- সেন, সুকুমার (সম্পাদনা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত, সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৩।
- সেন, সুকুমার ও মুখোপাধ্যায়, তারাপদ (সম্পদনা), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, সপ্তম মুদ্রণ ভাদ্র, ১৪১০।
- গুপ্ত, ক্ষেত্র, প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জন্মাষ্টমী ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ।
- গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর, সংস্কৃত সাহিত্যের দশরত্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৩০ শ্রাবণ, ১৪১১।
- বাঁদুড়ী, ডালিয়া, চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা-সমীক্ষা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার, লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা, পরিবেশক পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ জুলাই ২০০৩।
- চক্রবর্তী, ডঃ বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫।
- বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০৯।
- সেনগুপ্ত, পল্লব, লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিশীলিত ও পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০।
- মজুমদার, ভবেশ, মঙ্গলকাব্য : কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (আখেটিক খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহালয়া, ২০১০।
- চট্টোপাধ্যায়, সৌগত, লোকসংস্কৃতি : অন্দরমহল বারমহল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ২০১০।
- মল্লিক, দীপঙ্কর, লোক সংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময়, চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৬।

- বন্দ্যোপাধ্যায় ড. শ্রীকুমার ও চৌধুরী শ্রীবিশ্বপতি (সম্পাদিত), কবিকঙ্কন চণ্ডী (প্রথম ভাগ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন সংস্করণ ১৯৫৮।
- গঙ্গোপাধ্যায়, ড. মুনমুন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিক্রমা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শারদ উৎসব, ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ জন্মাষ্টমী ২০১০, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫।
- মুখোপাধ্যায়, অণিমা, সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ কলকাতা বইমেলা, ২০১৬।
- ভদ্র শ্রাবণী, দাস নিত্যানন্দ, পাল অরূপ (সম্পাদনা), মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পুনঃপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০২৩।

Citation: **Panja. A. & Halder. Dr. C. S.,** (2026) "লোক-ঔষধ ও লোক-চিকিৎসার স্বরূপ সন্ধান ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.